শিক্ষক আন্দোলন প্রসঙ্গে

আকমল হোসেন

এক সপ্তাহ ধরে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণের দাবিতে শিক্ষা জাতীয়করণ মহাজোট নামক সংগঠনের ব্যানারে অবস্থান কর্মসূচি, শাহবাগে ১০ দিন ধরে নিয়োগের জন্য সুপারিশকৃত ৬৫৩১ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পক্ষে প্রাথমিক সহকারী শিক্ষকরা শাহবাগে অবস্থান করছেন, তারা দুই দফা পুলিশের জলকামানের পানি ও লাঠিচার্জের পর পুলিশের সামনে গুলি করার করার জন্য বুক পেতে দিয়ে আন্দোলন অব্যাহত রেখেছেন। তারই পাশে মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ের এনটিআরসির নিবন্ধিত ১ম-১২তম ব্যাচের উত্তীর্ণরা নিয়োগের দাবিতে সপ্তাহ ধরে অবস্থানে রয়েছেন। এর আগে সংগঠনগুলো বিভিন্ন সময়ে থানা, জেলা, বিভাগীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে এবং সরকারকে তাদের চূড়ান্ত আন্দোলনের কর্মসূচি জানিয়ে ছিল। দাবি বাস্তবায়ন না হওয়ায় সর্বশেষ ভরসা হিসেবে ঢাকায় এসছেন, কর্তা ব্যক্তিদের নজরে আনার জন্য মিডিয়ার বন্ধুদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য, কারণ মফস্বলের মানুষ যে মানুষ, তাদের অভাব, সমস্যা আছে বা থাকতে পারে সেটা এসি রুমের নীতি নির্ধারকদের কানে পৌঁছানো নিয়ে অনেকেই সন্দিহান। প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকের স্বল্পতা রয়েছে। এই স্বল্পতা শিক্ষার্থীর অনুপাতের ঘাটতির কারণে, চাকরি থেকে অবসর এবং এবং চাকরি ছেড়ে অন্য চাকরিতে যোগদানের কারণে, শিক্ষার কাজ ছাড়াও ভোটার তালিকাসহ সরকারের অন্যান্য দপ্তরের কাজের সঙ্গে যুক্ত করার কারণে। ২০২৩ সালের বিজ্ঞপ্তির আলোকে দেশের অন্যান্য জায়গায় নিয়োগের কাজ শেষ হলেও তৃতীয় ধাপে ৬৫৩১ জন সহকারী শিক্ষকের নিয়োগের কাজ চূড়ান্ত হয় ৩১ অক্টোবর-২০২৪ এবং এরা সবাই নিয়োগপত্র হাতে পায়। যোগদানের পূর্ব মুহূর্তে সুপারিশবঞ্চিত ৩১ জন শিক্ষকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কোর্ট তাদের নিয়োগ স্থগিত করে। অন্যদিকে ১ম-১২তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া শিক্ষকদের নিয়োগ না দিয়ে এবং তাদের সময়কার নিয়োগর বয়সের সময়সীমা না থাকলেও পরবর্তিতে ৩৫ বছরের পরে বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষক কর্মচারী পেশায় নিয়োগ হবে না বলে সরকার নীতিমালা জারি করে। ফলে ১ম-১২তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া শিক্ষকদের বয়স ৩৫ বছর অতিক্রম করায় তারা আর নিয়োগ পাচ্ছেন না। নিবন্ধন পরীক্ষা চাকরি দেয়ার নিশ্চয়তা দেয় না বিধায় তাদের এই সংকট। একটি স্বাধীন দেশে শিক্ষার এই হাল-হকিকত দেখে সেটাই মানুষকে ভাবাচ্ছে। আমলাদের বয়ান শিক্ষার সংকট দূরিকরণে জাতীয়করণ অন্যতম প্রধান কারণ তবে সেটা করা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বিষয় এবং এটা করার দায়িত্ব রাজনৈতিক দল এবং সরকারের। এটি করতে জাতীয় বাজেটে আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি করার প্রয়োজন। সেজন্য রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মসূচি, নির্বাচনী ইস্তেহার এবং এবং সরকারের নীতিগত জায়গায় সরকারে প্রতিশ্রুতির বিষয়টি পরিষ্কার থাকতে হবে। আন্তর্জাতিক অনেকগুলো সমঝোতা স্মারকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকার স্বাক্ষর করলেও সে অনুযায়ী তাদের দলীয় কর্মসূচি এবং নির্বাচনী ইস্তেহারে শিক্ষা জাতীয়করণের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেনি, বরং বামপন্থীরা ছাড়া সব রাজনৈতিক দল সেবাখাত উদারিকরণের নামে শিক্ষাকে বেসরকারিকরণ করার পক্ষে। এমনতর বাস্তবতায় সব শিক্ষক ঐক্যবদ্ধ হয়ে সব রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে শিক্ষা জাতীয়করণের প্রতিশ্রুতি নিতে পারলে কিছু একটা হতে পারে। শিক্ষক সংগঠনগুলোকে তাদের কর্মসূচি নির্ধারণ করা এবং সেই আলোকে শিক্ষকদের সংগঠিত করে আন্দোলন করতে হবে। রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন হয়ে রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতে নেই এমন দাবি করে আন্দোলন করলে দাবি আদায় সম্ভব নয়। পেশাজীবী সংগঠনের বৈশিষ্ট্যকে ত্যাগ করে রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন হিসেবে কাজ করে শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয়করণ করা সম্ভব নয়। ৫৩ বছর তার প্রমাণ। শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয়করণের এই দাবিটি ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি প্রথম করলেও আজ সেটি সব শিক্ষক সংগঠনের কমন দাবিতে পরিণত হয়েছে। যদিও এই বিষয়টি সম্পর্কে সবাই পরিষ্কার নয়, সরকার তো নয়ই। সরকার নির্দিষ্ট নীতিমালা ছাড়াই বিক্ষিপ্তভাবে জাতীয়করণের তকমা দিয়ে যেটি করছে সেটি স্রেফ সরকারিকরণ, যা শিক্ষকদের একাডেমিক ফ্রিডম হরণ করে সরকারি কর্মচারী হিসেবে তল্পিবাহকে পরিণত করে যার ফলে শিক্ষার মূল কাজই ব্যাহত হচ্ছে বা হবে। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষক-কর্মচারীদের কিছুটা আর্থিক সুবিধা নিশ্চিত হলেও মর্যাদাগত দিক থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং বিশ্বায়নের আলোকে সব স্তরের শিক্ষক-কর্মচারীরা পিছিয়ে আছে। এর আগে জাতীয়করণমুখী আন্দোলনকারীদের সঙ্গে মাউশির ডিজি পরে শিক্ষামন্ত্রী অনেকগুলো শিক্ষক সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন কিন্তু কোন কাজ হয়নি। শিক্ষা সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার হিসেবে পৃথিবীর দেশে দেশে গৃহিত হলেও বাংলাদেশে সেই স্বীকৃতি পায়নি, সংবিধানের ১৫ ধারায় রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের ২৬ ধারায় নাগরিকের জন্য শিক্ষা লাভের অধিকার ঘোষণা করা হয়েছে। অন্ততপক্ষে প্রাথমিক ও মৌলিক পর্যায়ে শিক্ষা (১৮ বছর বয়স পর্যন্ত) অবৈতনিক হবে। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে, ২০১৫ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার ইনচন সম্মেলনে সেটারই প্রতিধ্বনি হয়েছিল। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সাধারণভাবে সহজলভ্য থাকবে, এবং উচ্চতর শিক্ষা মেধার ভিত্তিতে সবার জন্য সমভাবে উন্মুক্ত থাকবে। এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণের পর জাতিসংঘ সব সদস্য রাষ্ট্রকে ঘোষণাপত্রের বিষয়বস্তু প্রচার ও বাস্তবায়নের জন্য আহ্বান জানায়। সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে সবারই এগুলো বাস্তবায়নের কথা, কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানে সেটা কার্যকর হয়নি। বর্তমানে বাংলাদেশে তা কার্যকর হয়নি। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের সংবিধানের চার মূলনীতি জাতীয়তাবাদ গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার আলোকে এবং সংবিধানের ১৭ এর খ ধারার আলোকে একই ধারার সর্বজনীন বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। জাতীয় বাজেটে জিডিপির প্রাথমিকভাবে ৫% এবং পর্যায়ক্রমে ইউনেস্কোকে দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ৭% করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। তারই অংশ হিসেবে বঙ্গবন্ধু একবারে ৩৫১৭০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারীকরণ করেছিলেন এবং অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দিন সাহেবের সময় শিক্ষায় জিডিপির ২.২% (১৯৭২ সাল) বরাদ্দ করা হয়েছিল। বিগত প্রধানমন্ত্রীর আমলে ২৬ হাজার প্রাইমারি স্কুলকে সরকারি করা হয়েছিল। মাধ্যমিক পর্যায়ের ৯০ ভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত। শিক্ষায় অর্থায়ন, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বাড়েনি, শিক্ষা প্রশাসনে দলীয়করণের ভূত বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডিতে দলীয়করণ, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪টি বাদে সবগুলোতে দলীয়করণের ভূত চেপে বসেছে, ফলে দলীয়ভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলায় তুলনামূলক কম যোগ্যতার লোক অগ্রাধিকার পাচ্ছে, ফলে শিক্ষার গুণগত মানের ক্ষেত্রে বিরাট সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন কাজের টাকার কমিশন বন্টনে সমঝোতা করতে দেখা যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাবশালীদের। সৃজনশীল আর এমসিকিউ পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে এ+ আর গোল্ডেনের সংখ্যা বাড়লেও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ক্ষেত্রে ন্যূনতম যোগ্যতা প্রদর্শন করতে পারছে না। শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য শিক্ষায় অর্থায়ন বৃদ্ধি করা জরুরি কিন্তু আমাদের দেশে দিনদিন সেটা কমছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে যেখানে শিক্ষা ও প্রযুক্তিতে বরাদ্দ ছিল ১.৮০ % সেখানে ২০২২-২৩ অর্থবছরে কমে ১,৭৬ % হয়েছে। ২০১৫ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার ইনচনে ওয়ার্ল্ড এডুকেশন ফোরামের সম্মেলনে সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে শিক্ষামন্ত্রী ও